শিকড়ের সন্ধান- প্রেক্ষিত জঙ্গীবাদ

(মুন্সী কেফায়েতুল্লাহ)

গত শুক্রবার (২০-০৩-২০০৭) দৈনিক জনকণ্ঠে মামুনুর রশীদের "জঙ্গীদের শিকড় কোথায়" শীর্ষক একঠি লেখা প্রকাশিত হয় যার সুত্র ধরেই অত্র প্রসংগের অবতারণা। জঙ্গীবাদ কি কোন বৃক্ষ; যদি বৃক্ষই হয় তবে সে বৃক্ষের শিকড় কোথায়? অত্যন্ত সঙ্গত প্রশ্ন।

বেশ কয়েকদিন যাবত দেশের সর্বত্র জঙ্গী ধরার জোর অভিযান শুরু হয়েছে। শীর্ষ ৬ জঙ্গীর ফাঁসি এবং পরবর্তীতে ঝালকাঠির পিপি হত্যার পর এই অভিযানে আরও গতি সঞ্চার হয়েছে বলে মনে হয়। জঙ্গীদের এ্যারেস্ট করার সময় তাদের কাছ থেকে বোমাবিস্তল জাতীয় মারণাস্ত্রের সাথে আরেকটি জিনিস অবধারিতভাবে পাওয়া যাচ্ছে-, বিভিন্ন প্রকারের জেহাদী বই। সিলেটের সুর্য্যদীঘল বাড়ীতে কোন মারণাস্ত্র পাওয়া যায়নি, তবে জেহাদী বই ঠিকই পাওয়া গিয়েছিল। তৎকালীন সংবাদ পত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী উক্ত বইগুলি সিজার লিষ্টে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেনি। কতৃপক্ষীয় কাজকর্ম দেখলে ধারণা হয়, বোমা বা পাওয়ার জেল জাতীয় পদার্থের ব্যাপারে তারা যতটা সিরিয়াস, নিরীহ বইগুলির ব্যাপারে ততটা না। অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত বইগুলি গ্রেনেড বা পাওয়ার জেলের চেয়েও সহস্রগুন বেশী ভয়ঙ্কর। জঙ্গীবাদের শিকড় কোথায় এই প্রশ্নের জবাব নিহিত রয়েছে উক্ত পুস্তিকাগুলিতে। কে না জানে যে শিকড়টি উপড়িয়ে ফেলতে না পারলে অনুকুল আবহাওয়া পেলেই জঙ্গীবৃক্ষটি আবার পুর্ণোদ্যমে বিকশিত হয়ে উঠবে।

এ যাবতকাল যেসব জঙ্গী ধরা পড়েছে, তাদের বক্তব্য শুনলে মনে হয়- তারা মোটেও কোন খারাপ কাজ করছে না। ধর্মের জন্যে রক্ত দিয়ে পরকালে অক্ষয় স্বর্গ কিনছে তারা। মানসিকভাবে তারা এতটাই মটিভেটেড যে ছাড়া পেলে আবারও তথাকথিত জেহাদে ঝাপিয়ে পড়তে কিংবা আরও অধিক সংখ্যক কাফের হত্যা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধান্বিত নয় তারা। এজন্যে জীবনটাও যদি চলে যায় পরকালে তারা পাবে শাহাদাতের দরজা। তারা আরও বলেছে- তাদের এই কর্মকান্ডের পেছনে রয়েছে স্বর্গীয় নির্দেশ; অর্থাৎ কোরাণহাদিসের সাপোর্ট। তাদের এই দাবী কতটুকু সত্য? যেসব জেহাদী বই জঙ্গীদেরকে এসব জঘন্য কার্য্যকলাপে উদ্বুদ্ধ করছে, কী আছে সেসব বইতে? লিখেছেই বা কারা? প্রায়শই বিভিন্ন প্রকারের লেখা নিষিদ্ধ করেন সরকার। কিন্তু জঙ্গীদের কাছ থেকে উদ্ধারকৃত কোন বই আজ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হয়নি! কেন? যে বই একটি রাষ্ট্রের ভিত্তিমুল কাঁপিয়ে দিতে পারে, নিরীহ আদমসন্তানের রক্তে ভিজিয়ে দিতে পারে দেশের মাটি, সেসব বইয়ের লেখক, প্রকাশক বা মুদ্রাকরদের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে- আজ পর্য্যন্ত তার একটিমাত্র উদাহরণও খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ প্রকৃত সত্য হলো এই যে একটি যুদ্ধে সাধারণ সৈনিকের চেয়ে সেনাপতির দায়ভাগ অনেক বেশী। যারা বোমা মেরে মানুষ হত্যা করেছে, সেই শায়খ রহমান বা বাংলা ভাইরা সাধারণ সৈনিক মাত্র। তাদের কাছ থেকে যে জেহাদী বইগুলি উদ্ধার করা হয়েছিল, সেগুলির লেখকরা হচ্ছেন সেনাপতি। এই সেনাপতিদের অনুপ্রেরণাতেই একজন নিরীহ মানবশিশু ভয়ংকর জঙ্গী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সেনাপতিদেরকে অক্ষত রেখে কিছু চুনোপুটি সৈনিককে এ্যারেস্ট করে বা ফাঁসি দিয়ে যারা যুদ্ধ জয় করেছেন বলে আত্মতৃপ্তিতে ভুগেন তারা যে বোকার স্বর্গে বাস করছেন তাতে তোন সন্দেহ নেই।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় বিবেচনা করা জরুরী। তৃনমুল পর্য্যায়ের যেসব জেহাদীদের ধরে সরকার জেলখানা ভরে ফেলছেন, তাদের কারও আরবী ভাষা বুঝার সাধ্যি নেই। মাওলানা দেলওয়ার হোসেন সাঈদিদের মতো তথাকথিত মাওলানা সাহেবরা কোরাণহাদিসের যে ব্যাখ্যা তাদের সামনে তুলে ধরেন, তারা তাই অভ্রান্ত সত্য বলে ধরে নিয়ে তা বাস্তবায়নে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ব্যাখ্যা ভুল না শুদ্ধ তা বিচার করার ক্ষমতা এদের নেই। সিলেটের আলিয়া মাদ্রাসার মাঠে সাঈদির মাজার বিরোধী তফসির

মাহফিলের পরেই ঘটতে থাকে শাহ্‌ জালাল মাজারের আক্রমনগুলি। সুতরাং ধর্মীয় বই হিসেবে যেসব বই আমাদের সমাজে চালু আছে, তার মূল্যায়ন করা অতীব জরুরী। পাঠকের সামনে এখন একটি উদাহরণ পেশ করবো আমি। পবিত্র কোরাণের কয়েকটি আয়াত ও তার বাজার প্রচলিত ব্যাখ্যা।

সুরা বাকারা, মদীনায় অবতীর্ণ, (আয়াত ১৯০-১৯৫)ঃ
"আর লড়াই করো আল্লাহর পথে তাদের সাথে যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারও প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না (১৯০)। আর তাদেরকে হত্যা করো যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে যেখান থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে। বস্তুতঃ ফেৎনা-ফ্যাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ। আর তাদের সাথে লড়াই করো না মসজিদুল হারামের নিকট যতক্ষন না তারা সেখানে তোমাদের সাথে লড়াই করে, তা'হলে তাদেরকে হত্যা করো। এই হলো কাফেরদের শাস্তি (১৯১)। আর তারা যদি বিরত থাকে, তা'হলে আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু (১৯২)। আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই করো যে পর্যন্ত না ফেৎনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর তারা যদি নিবৃত হয়ে যায়, তা'হলে কারও প্রতি কোন জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা জালেম (তাদের ব্যাপার আলাদা) (১৯৩)। সম্মানিত মাসই সম্মানিত মাসের বদলা। আর সম্মান রক্ষা করারও বদলা রয়েছে। বস্তুতঃ যারা তোমাদের প্রতি জবরদস্তি করেছে, তোমরাও তাদের প্রতি জবরদস্তি করো, যেমন জবরদস্তি তারা করেছে তোমাদের উপর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, যারা পরহেজগার আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন (১৯৪)। **আর ব্যয় করো আল্লাহর পথে, তবে নিজের জীবনকে স্বহস্তে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না। আর মানুষের প্রতি দয়া করো। আল্লাহ দয়াশীলদেরকে ভালবাসেন (১৯৫)।**

উপরোক্ত আয়াতগুলির সরলার্থ বুঝতে সাধারণ পাঠকেরও খুব একটা অসুবিধা হয় কি? বোধ হয় না, কারণ একজন মুসলমান কীভাবে অত্যাচারী জালেমের মোকাবেলা করবে তারই সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে আয়াতগুলিতে। বলা হয়েছে যে শক্তি দিয়েই শক্তির মোকাবিলা করতে হবে, তলোয়ারের সাথে তলোয়ার দিয়ে লড়তে হবে- ফুল দিয়ে নয়। রাসুলের এই নির্দেশ বর্তমান যুগেও কতটা বাস্তব এবং জীবনমুখী- আশা করি পাঠককে তা আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। আয়াতগুলিতে আরেকটি প্রচ্ছন্ন কিন্তু সুস্পষ্ট মেসেজ রয়েছে- যারা অত্যাচারী এবং সমাজে দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টিকারী শুধুমাত্র তাদের বিরুদ্ধেই লড়াই করার কথা বলা হয়েছে, সাধারণ লোকদের বিরুদ্ধে নয়। এবং কোন অবস্থাতেই সীমা লঙ্ঘন করতে কঠোরভাবে বারণ করা হয়েছে। দানশীলতা এবং শত্রুর প্রতি দয়া প্রদর্শনেরও নির্দেশ আছে আয়াতগুলিতে।

তবে মুশকিল হয়েছে যে কোরানের প্রকৃত অর্থ বুঝা নাকি আমাদের মতো সাধারণ লোকদের পক্ষে সম্ভব নয়, সরল অর্থের পেছনে লুক্কায়িত থাকে গুরুত্বপুর্ণ অনেক মারেফাতি অর্থ -যার সঠিক ব্যাখ্যার এখতিয়ার আছে কেবলমাত্র মাওলানা মওদুদী কিংবা আল্লামা আজিজুল হকদের মতো হাদিস-ফিকাহ বিশেষজ্ঞের। আম্‌-জনতাকে কোরানের সঠিক অর্থ হৃদয়ঙ্গাম করাতে উপরোল্লিখিত ১৯৫নং আয়াতের কীরুপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে- তার একটা নমুনা পেশ করা গেল। মাওলানা মুফতি মোহম্মদ শাফীর (রহঃ) মা'রেফুল কোরানের বাংলা অনুবাদ করেছেন শ্রদ্ধেয় মাওলানা মুহিউদ্দিন খাঁন সাহেব। তফসির গ্রন্থটির ১০০নং পৃষ্ঠায় ১৯৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এভাবেঃ-
"ওয়া লা তুল্‌কু বিআইদিকুম ইলা তাহ্‌লুকা ওয়া আহ্‌ছিনু -(এবং নিজের জীবনকে স্বহস্তে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না) এই আয়াতাংশের শাব্দিক অর্থ অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্ট। এতে স্বেচ্ছায় নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করতে বারণ করা হয়েছে। এখন কথা হলো যে 'ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা' বলতে এখানে

কি বুঝানো হয়েছে? এ প্রসঙ্গে কোরআন মজীদের ব্যাখ্যাতাগণের অভিমত বিভিন্নপ্রকার। ইমাম জাস্‌সাস ও ইমাম রাজী (রহঃ) বলেছেন, আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত উক্তির মাঝে কোন বিরোধ নেই। প্রত্যেকটি উক্তিই গৃহিত হতে পারে। হযরত আবু আইয়ুব আনসারি (রাঃ) বলেন এই আয়াত আমাদের সম্পর্কেই নাজেল হয়েছে। আমরা এর ব্যাখ্যা উত্তম রুপেই জানি। কথা হলো এই যে, আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে যখন বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, তখন আমাদের মধ্যে আলোচনা হলো যে এখন আর জিহাদের কি প্রয়োজন? এখন আমরা আপন গৃহে অবস্থান করে বিষয় সম্পত্তির দেখাশোনা করি। এই প্রসঙ্গেই আয়াতটি নাজেল হলো। এতে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে **'ধ্বংসের' দ্বারা এখানে জেহাদ পরিত্যাগ করাকেই বুঝানো হয়েছে। এতদ্বারা প্রমানিত হচ্ছে যে, জেহাদ পরিত্যাগ করা মুসলমানদের জন্যে ধ্বংসেরই কারণ।** সে জন্যেই হযরত আবু আইয়ুব আনসারি (রাঃ) সারা জীবনই জেহাদ করে গেছেন। শেষ পর্যন্ত ইস্তাম্বুলে শহীদ হয়ে সেখানেই সমাহিত হয়েছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), হুযায়ফা (রাঃ), ক্বাতাদা (রাঃ) এবং মুজাহিদ ও যাহ্‌হাক (রাঃ) প্রমুখ তফসির শাস্ত্রের ইমামগণের কাছ থেকেও এরূপই বর্ণিত হয়েছে।"

বুঝুন ঠেলা! সহজ সরল সুন্দর কতগুলি আয়াতকে গোটাকয়েক রাদিয়াল্লাহ্‌ আর রাহমাতিল্লাহ'র বরাত দিয়ে কী রকম জটিল ও প্রাণঘাতি করে তোলা হলো। আল্লাহ বলেছেন যে 'তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো, নিজের জীবনকে নিজের হাতে ধ্বংস করে ফেলো না। মানুষের প্রতি দয়া করো, আল্লাহ দয়াশীলদের ভালবাসেন'। অর্থাৎ সম্পদশালী লোক তার সম্পদ যেন মানুষের কল্যানে ব্যয় করে, যেন সেই সম্পদের অপব্যবহার করে নিজের জীবনকে ধ্বংস করে না ফেলে- আয়াতগুলির সরলার্থ এরূপই হওয়ার কথা। কে না জানে যে অর্থই সকল অনর্থের মূল। অর্থের অভাবে কেউ একবেলা খাবার পায় না, আবার কেউ মদ-জুয়া-নারী-বাড়ী-গাড়ির পেছনে খরচ করে জীবনটাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। এই সহজ সুন্দর আয়াতগুলির মধ্যে জেহাদ কী করে ঢুকে পড়ল পাঠক! শুধু জেহাদ নয়, আজীবন জেহাদ। দেশ থেকে দেশান্তরে। কারণ উক্ত আয়াতের অনুপ্রেরণাতেই আনসারি (রাঃ) সাহেব দেশ হতে দেশান্তরে জেহাদে নেমেছেন এবং জাজিরাতুল আরবের সীমানা পেরিয়ে সুদুর ইউরোপের প্রান্ত নগরী ইস্তাম্বুল নগরীতে যেয়ে জেহাদ করতে করতে শহীদ হয়েছেন। মাওলানা সাহেবদের এই তফসির ফলো করতে যেয়ে যদি শায়খ রহমান, বাংলা ভাই, মুফতি হান্নানরা আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া বা বাংলাদেশে যেয়ে জেহাদে শরীক হয় বা ছেলেদেরকে শাহাদত বরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে, তাহলে আর তাদের দোষ দিয়ে লাভ কি? মাননীয় তফসিরকারদের ব্যাখ্যা মোতাবেক ঘরে বসে থাকার উপায় নেই। দেশ থেকে দেশান্তরে জেহাদ করে যেতেই হবে। একটা শেষ হলে আরেকটা, কারণ খোদার দুনিয়ায় কাফের-মুশরেকের তো আর কোন অভাব নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবী নামক গ্রহটির বাশিন্দাদের মধ্যে পাঁচ ভাগের চার ভাগই হচ্ছে কাফের-মুশরেক। সুতরাং মাওলানা সাহেবের বিধান মোতাবেক দুনিয়াটাকে এক অন্তহীন যুদ্ধক্ষেত্র আর রক্তপাতস্থলে পরিণত করে ফেলা ছাড়া আর কোন্‌ উপায় আছে!

এমতবস্থায় বিক্ষিপ্তভাবে গোটাকয়েক জঙ্গী পাকড়াও করলেই দেশ হতে জঙ্গীবাদ উচ্ছেদ হয়ে যাবে বলে যারা ভাবছেন- আবারও বলছি তারা মুর্খের স্বর্গে বাস করছেন। পবিত্র গ্রন্থগুলির যেসব ভ্রান্ত ও মনগড়া ব্যাখ্যা যুগের পর যুগ প্রতিবাহিত হয়ে সমাজকে কেবলমাত্র পেছনের দিকে ঠেলে দিয়েছে, সেইসব ব্যাখ্যাকে প্রত্যাখ্যান করে নুতন প্রজ্ঞার আলোকে তার ব্যাখ্যার ব্যবস্থা করা অতীব জরুরী। আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে একটি প্রিমিটিভ সোসাইটিতে একজন মহামানব এসেছিলেন একটি ফিলসফি নিয়ে, প্রাগ্রসরতার ফিলসফি। আমরা তার ফিলসফিকে অনুধাবন না করে তার দৈনন্দিন খুটিনাটিকেই মুখ্য করে নিয়েছি, যে খুটিনাটি সম্পাদিত হয়েছিল স্থানকালের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে। দেড় হাজার বছরে বিশ্ব অনেক বদলেছে, পরিবর্তন হয়েছে সমাজের। নুতন দিনের আলোকে নিত্যি

নতুন চাহিদার প্রেক্ষিতে নূতনভাবে আবিস্কার করতে হবে সেই ফিলসফিকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নবীর যুগে দাসপ্রথা ছিল সর্ব সমাজে প্রতিপালনীয় একটি প্রথা। ইহুদি, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ প্রতিটি সমাজেই এই কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। যথারীতি আরব দেশেও ছিল। রাসুল এই প্রথা উচ্ছেদ করে যাননি, পালন করেছেন। কিন্তু দাসপ্রথার ভেতর যে অমানবিক ট্রাজেডি লুক্কায়িত আছে, তা অনুভব করেছেন তিনি। তাই দেখা যায়, দাসমুক্তিকে তিনি সর্বোচ্চ পুণ্যকর্ম বলে বিধান দিয়ে গিয়েছেন, দাসমুক্তির বদলে রোজা রাখার মতো অবশ্যকরণীয় ধর্মীয় প্রতিপাল্যকেও রেয়াত দিয়েছেন। দাসকে মুক্ত করে তাকে মুসলমানদের সেনাপতি বানিয়েছেন। অর্থাৎ- দাসপ্রথাকে রহিত না করলেও রাসুলের স্পিরিট ছিল সুস্পষ্টভাবে দাসপ্রথার বিরুদ্ধচারী। সমাজ বিবর্তনের ধারায় প্রাতিষ্ঠানিক দাসপ্রথা এখন আর প্রচলিত নেই। কালের অনিবার্যতায় নবীর গুটিকয়েক দাসদাসী ছিল, তাই সুন্নতের দোহাই দিয়ে কোন মাওলানা যদি একবিংশ শতাব্দীতে বসে দাসপ্রথাকে ইসলামসম্মত বলে ফতোয়া দেন, তবে বলতে হবে যে তিনি নবীর ফিলসফিকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ঠিক অনুরূপভাবে, সারভাইব করার খাতিরে বহু যুদ্ধ করতে হয়েছে নবীকে। সেইসব যুদ্ধে সৈন্যদেরকে অনুপ্রেরণা দিতে শত্রুহত্যার বাণী দিতে হয়েছে তাকে যা ছিল একান্তভাবেই অবস্থাকেন্দ্রিক। তিনি যখন মক্কায় ছিলেন তখন 'ক্বিতাল' বা যুদ্ধের কথা বলেননি। মদীনায় হিযরত করার পর যখন একটি রাষ্ট্র স্থাপন করলেন এবং নবীর উর্দির উপর রাজার উর্দি চাপালেন, তখন প্রয়োজনের খাতিরেই সশস্ত্র যুদ্ধের বাণী দিতে হয়েছে তাকে। সুতরাং তার এই বাণীগুলিকে সেই সময়ের পরিস্থিতির আলোকেই বিবেচনা করতে হবে। তার সেই বাণীকে মুলধন করে কেউ যদি একবিংশ শতাব্দীতে বসে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে অনন্তকাল ধরে জেহাদ পরিচালনার ডাক দেন, তবে বলতে হবে যে তিনি নবীর ফিলসফি অনুধাবন করতে পারেননি।

জঙ্গীবাদকে সমাজ হতে দুরীভুত করতে হলে ধর্মগ্রন্থের প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলির পুর্ণনিরীক্ষন অতীব জরুরী। জঙ্গীবাদের শিকড় যদি কোথাও নিহিত থাকে- তবে এইখানে। 'আমরা সবাই তালেবান, বাংলা হবে আফগান'- এই শ্লোগানের প্রবক্তারা যদি কোরাণহাদিসের ব্যাখ্যা নিয়ে আসে তবে তার অবধারিত প্রডাক্ট হিসেবে আবির্ভুত হবে বিচারক হত্যাকারী মামুনেরা। কিছু লোককে এ্যারেষ্ট করে এর সাময়িক প্রশমন হয়তো সম্ভব, তবে মাদ্রাসাগুলিতে যে পর্য্যন্ত তালেবান নেতাদের দ্বারা লিখিত বা অনুদিত বইসমুহ বহাল থাকবে এবং কোমলমতি শিশু কিশোররা সেই তালেবান-মার্কা ব্যাখ্যা মগজে ঢুকিয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবে- তারা অবশ্যই সন্ত্রাসকে ঐশী নির্দেশ মনে করে মানুষ হত্যাকে পবিত্র কাজ বলে মনে করবে। এ বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

তাং-২১শে এপ্রিল,২০০৭।

ই-মেইলঃ kfmunshi@yahoo.com